দৈনিক ইনকিলাব ... 010

তারিখ 2 AUG 1988
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম ... 1

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

ইংরেজীর প্রতি অবহেলা একটি আত্মঘাতী পরিকল্পনা

মোসাম্মৎ নাসরীন আকতার

আজকাল অনেক বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবীর সাক্ষাৎ আমরা যত্রতত্র পাই। নানা প্রসঙ্গে তারা পত্রিকান্তরে অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলী দিয়ে থাকেন। তারা নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারীদের গোত্রভুক্ত। জানি, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। তবে ভরসা— এ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের হাতে কলম থাকলেও হ্যাণ্ডগ্রেনেড বা পিস্তল জাতীয় কিছু আছে বলে মনে হয় না। তাই, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে নির্বোধ উপাধি লাভ করলেও প্রাণটা যাবার সম্ভাবনা কম। তারা অফিসে-আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবীতে আত্মহারা। এ বিষয়ে আমারও আপত্তির কারণ নেই। তবুও যে কারণে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করছি, 'প্রতিবাদ করছি, সেটাই' ভাববার বিষয়।' এ ভাবনাটা আমার একার নয়, এ ভাবনা সমগ্র দেশবাসীর— আপামর জনগণের। ইফ্‌ফাত আরা বেগম প্রণীত গত ১৫-১১-৮৭ ইং তারিখের "দৈনিক ইনকিলাব" পত্রিকায় লিখিত "বাংলা ও ইংরেজীর অবস্থান" শিরোনামের অতি উচ্চমার্গের আলোচনা পাঠ করে আমার কাছে তাঁকে বুদ্ধিজীবীদের একজন বলেই মনে হয়েছে। তিনি তাঁর আলোচনায় অনেক কথাই বলেছেন। শুধু বলেননি যে, ইংরেজী না জানা থাকলে বিসিএস পরীক্ষায় পাশ করা যায় কি-না? বলেননি, ইংরেজী না জানলে সেনাবাহিনীর কমিশন লাভ করা যায় কি-না? বলেননি, ইংরেজী না জানলে কোন শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে (ব্যবসার খাতিরে যাদের বহির্বিশ্বের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়) চাকুরী লাভ করা যায় কি-না? তিনি বলেননি, ইংরেজী না জানলে বিদেশ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর মত তাবৎ সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিম্নমান সহকারী অপেক্ষা উচ্চপদে চাকুরী লাভের আশা করা যায় কি-না? তিনি এও বলেননি যে, বাংলাদেশ সরকারের কোন বৈদেশিক অফিসে ইংরেজী না জানা কোন বিএ/এমএ পাশের চাকুরী হয় কি-না? তিনি বলেননি, বাংলাদেশী কোন কোম্পানী বৈদেশিক অফিসে কিংবা কোন বৈদেশিক কোম্পানীর বাংলাদেশী অফিসে ইংরেজী না জানা লোকের চাকুরী লাভ হয় কি-না?

অবশ্য তিনি একটি কথা খুবই স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আর তা হচ্ছে যে, শহরে-নগরে একশ্রেণীর ধনী লোক আছেন যারা তাদের ছেলে-মেয়েদের মাসিক ৪/৫ শত টাকা বেতন দিয়ে কিণ্ডারগার্টেনসমূহে লেখাপড়া করিয়ে থাকেন। যেখানে শিক্ষাদানের মাধ্যম ইংরেজী। অপরদিকে, ছেলে-মেয়েদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য তারা মাসিক হাজার হাজার টাকা ব্যয়ে একাধিক গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। কেহ কেহ আবার ছেলে-মেয়েদের ইংরেজী শিক্ষার পথ খোলাসা করার জন্যে বিদেশের স্কুলে লেখাপড়া করিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশের ৮৫% লোক গ্রামে বাস করেন। শহরবাসীদের মধ্যে নিম্নবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত ৯০% যারা সীমিত আয়ের মানুষ। তাদেরসহ যাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৯৫% তাদের অবস্থাটা দেখুন। গ্রামে প্রতিষ্ঠিত প্রাইমারী এবং মাধ্যমিক স্কুলসহ শহরের বেশীর ভাগ স্কুলের অবস্থা প্রায় একই। তৃতীয় শ্রেণী হতে ইংরেজী পাঠের নিয়ম থাকলেও সরকারী শিথিলতার কারণে শিক্ষকগণ আরও শিথিল হয়ে পড়েছেন। তাই ৫ম শ্রেণীর সিঁড়ি অতিক্রমকারী ছাত্র-ছাত্রীগণ সকলে ইংরেজী বর্ণমালাগুলি ভাল করে শিখে যায় কি-না সন্দেহ আছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে যেহেতু আর বর্ণমালা পড়ানো হয় না সেহেতু ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল করে ইংরেজী রীডিংটুকুও পারে না। তাদের তখন অবস্থা হয় "ত্রাহি মধুসূদন"। তখন তারা কি ইংরেজী শেখার পরাকাষ্ঠা দেখাবে না পরীক্ষা পাশের পুরিয়া তৈরী করবে বুঝে উঠতে পারে না। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান আকার্ষণ হল পরীক্ষা পাশ, তাই তারা বানানো-বটিকা গেলে অর্থাৎ নোট মুখস্থ করার প্রাণান্ত চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। এরপর কোনটা পাশ করে কোনটা করে ফেল। হয়ত ইংরেজীতে ৩৩% নম্বর পেয়ে (দুই-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) যে ছাত্র বা ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১ম ও ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় তারা যথেষ্ট কসরৎ করে উচ্চ-মাধ্যমিকের ধাপটা ডিঙ্গানোর আশায় তৎপর হয়। এমনিভাবে ৩৩%-এর জোরে যখন উচ্চ-মাধ্যমিকও ডিঙ্গানো যায় তখন আর পায় কে? ইংরেজী বিহীন বিএ পরীক্ষায় হয়তো খুব সুনামের সাথেই উৎরে গেল, তারপর অনেকে এমএ টাও বাকী রাখে না, হয়ে আগ্রহী নন। শহরের কিছু ব্যতিক্রমধর্মী স্কুল-কলেজ ছাড়া গ্রাম-গঞ্জের সকল স্কুল-কলেজেই বর্তমানে ১৯৭২ সন থেকে ১৯৭৫-৭৬ইংরেজী সন পর্যন্ত মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষকদের (যারা অন্য কোন ভাল চাকুরী লাভে ব্যর্থ হয়ে শিক্ষকতার চাকুরীতে প্রবেশ করেছেন) তাদের একচেটিয়া দখলে।

মুরুব্বীস্থানীয়রা বলেন, ঐ সময়টিতে না-কি রিলিফে সার্টিফিকেট দেয়া হত। এরপর অবশ্য রিলিফে পাশ দেওয়া হয় না— তবে শিক্ষার মানের কোন উন্নতি হয়েছে তা-ও নয়। শিক্ষকগণ নমস্যঃ। তাদের কটূক্তি করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। তবে ইংরেজী শিক্ষা যে দেশ ছেড়েছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ফলে দেশে দু'টি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। একটি গ্রাম-গঞ্জের কৃষক, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ৯৫% লোক, আর অপরটি বিশেষ সুবিধাভোগী শহরের ৫% ধনিক শ্রেণী। ইংরেজী জানার সুবাদে দেশের সকল বড় বড় পদগুলি তাদের জন্য বরাদ্দ। আর এতে পৃষ্ঠপোষকতা করছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর নামে স্কুল-কলেজ হতে ইংরেজী উচ্ছেদ করার মত মহতি পরিকল্পনা।

ইংরেজী ভাষা না জানার জন্য বৃটিশ আমলে হিন্দু ও মুসলমানগণ যেরূপ দু'টি আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, আজ আবার দেশের আপামর জনসাধারণকে ঐ একই কৌশলে বিভক্ত করে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। ইফ্‌ফাত আরা বেগম কর্তৃক উদ্ধৃত জওহরলাল নেহেরুর মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, "যিনি ভাল ইংরেজী জানেন তিনি ভাল বাংলাও জানেন।" কারণ বাংলা আমার মায়ের ভাষা। এ ভাষায় কথা বলার জন্য ডক্টরেট ডিগ্রীর প্রয়োজন নেই। অপরদিকে আমরা যে ইংরেজীটা শিখি তার অর্থটাও শিখি, আর বলাই বাহুল্য, ঐ অর্থ শেখার কাজটা বাংলায় অর্থাৎ মাতৃভাষায়ই করা হয়। তাহলে ইংরেজী শিক্ষার অসুবিধাটা কোথায়? ১৯৫২-তে আমাদের পিতা/পিতামহগণ বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন এ জন্যে যে, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানীদের মায়ের ভাষাকে আমাদের মায়ের ভাষার স্থলাভিষিক্ত করার চক্রান্ত ছিল। আজ আমার দেশের বুদ্ধিজীবিগণ কিসের চক্রান্ত দেখছেন? যারা বুদ্ধিজীবী হিসাবে নাম কিনছেন তারাতো ইংরেজী জানেন। কই, তারাতো বিদেশী হয়ে যাননি। আমারতো মনে হয়, তারা একাধিক ভাষা জানেন বলেই জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছেন। আমরাতো বাংলা ভালই পারি, কেননা বাংলা পড়তে পারি, লিখতে পারি, বলতে পারি, হয়তো আমাদের মধ্যে অনেকের তাদের মত এমএ ডিগ্রীটাও রয়েছে। কিন্তু বুদ্ধিজীবী উপাধি লাভের জন্য যে বড় পদটি লাভ করা দরকার সেটিতো আমাদের ভাগ্যে জোটেনি। তার কারণ তো ঐ একটাই, ইংরেজী না জানা।

আইনজীবিগণ আদালতে ইংরেজী চালু রাখার দাবী জানিয়েছেন। তারা বলেন, আইন সংক্রান্ত পুস্তকাদি এবং বেফারেন্সসমূহ সবই ইংরেজী। আর এগুলি এখনও অনুবাদ সম্ভব হয়নি। বলি ভায়া— ইংরেজী না জানলে অনুবাদ করবে কে? এই কাজটির জন্যও তো ডাকতে হবে ৬-১২-৮৭ ইং তারিখের "দৈনিক ইনকিলাব"-এ প্রকাশিত ইংরেজী নিয়ে কথাঃ একটি প্রতিবাদ-এর লিখক জনাব মিন্নাত আলীর মত গুটিক শ্রেণীর ফাউকে। তারা চর্বণ করে দিলেই আমরা চর্বিত চর্বণ করব। কিন্তু মনে রাখা উচিত, কোন চর্বিত জিনিসে রস থাকে না।

মিন্নাত আলীরা রস খেয়ে আমাদের জন্য কি রাখবেন? তারা বোধ হয় মনে করেন, দেশটার আসল মালিক ঐ ৫% মিন্নাত আলী ও ইফ্‌ফাত আরাদের মত ভাগ্যবানগণ। তাই যদি হয় তবে ১৯৫২ ও ১৯৭১-এ আপামর জনসাধারণ তাদের বুকের তাজা রক্ত উৎস্বর্গ করল কি তাদেরই স্বার্থে? যে দেশে একটা পিন তৈরী করার মত প্রযুক্তি জ্ঞানও বিদেশী বই পড়ে, বিদেশী সহযোগিতা নিয়ে অর্জন করতে হয় সে দেশের ৯৫% লোককে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়ে দেশের উন্নতির কোন মহাকৌশল তারা অর্জন করছেন? এর উত্তরও তারা দেবেন না জানি। আর দিলেও তাদের উত্তর মিন্নাত আলী ও ইফ্‌ফাত আরা বেগমদের মতই হবে।

আমার দেশের ইফ্‌ফাত আরা, মিন্নাত আলীগণ শুধুমাত্র বাংলা বাংলা করে দেশকে উদ্ধার করার মহাপরিকল্পনায় ব্যস্ত। বাংলার প্রতি এত দরদ সত্ত্বেও তারা বাংলা ভাষাকে কি দিয়েছেন? মিন্নাত আলীরা যে দু'-একটি বই বাজারে ছাড়েন তা-ও বিদেশী বই-এর অর্থাৎ যা কি-না বিদেশী ভাষায় ছিল তারই চর্বিত রূপ। অর্থাৎ বিদেশী ভাষায় পাঠ করে বাংলায় প্রকাশ করেছেন মাত্র।

তাদেরকে বলি— রবীন্দ্রনাথ বাংগালী কিন্তু বাংলাদেশী নন। আপনারা ভাষার খাতিরে একজন বিদেশীকে পুঁজো করছেন। এ-ও জানি, কোন ইংরেজ যদি আপনাদের হয়ে কোন কিছু বাংলা ভাষায় লিখে দেন তা-ও লুফে নেবেন। নিজেরা যত বাহাদুরীই দেখান না কেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কিছু দিয়ে যাবার মুরোদ আপনাদের নেই। তাই, বাংলাদেশী সৃজনশীল সাহিত্য রচয়িতা থাকলেও আপনারা তাদের ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের পুঁজো করছেন। আপনাদের যদি জাতীয়তাবোধ থাকত তবে রবীন্দ্রনাথকে পুঁজো না করে দেশের যারা আর্জেন তাদের দিকে নজর দিতেন। গ্রহণ করতেন নিজের দেশের কবি-সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিকদেরকে।

আর বিজ্ঞানী, তারাও বিদেশী বিজ্ঞান পড়েই জ্ঞান অর্জন করছেন। তাহলে ইংরেজী ভাষাটার অপরাধ কোথায়? আপনাদের ছেলে-মেয়েরাতো লেখাপড়া করে বিদেশে কিংবা লেখাপড়া শেষে বেশীর ভাগই পাড়ি জমায় বিদেশে। ওখানে কি তারা বাংলা চর্চা করে? স্কুল-কলেজে আমরা যে বিজ্ঞান পড়ি তার ৯৯.৫০% ভাগই বিদেশী লেখক তথা বিজ্ঞানীর লেখা। তারা তো তাদের আবিষ্কারের কাহিনী আমাদের জন্য বাংলায় লিখে যাননি। তাদের লিখা পড়েই যখন আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, দেশের উন্নয়নের জন্য নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করতে হবে, তখন তাদের ভাষাটা বর্জন করার মাঝে মহত্তটা কোথায়? তাহলে উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য একটাই, আর সেটা হচ্ছে, আপনারা গুটি কয়েক দৌতলায় উঠে সিঁড়ি খানা পুড়িয় দিচ্ছেন। যাতে আর কারো দোতলায় ওঠার উপায় না থাকে। অতএব, সনির্বন্ধ অনুরোধ— সিঁড়িটা পুড়াবেন না। ওটা শুধু আপনাদের একার নয়। এর অধিকার বাংলাদেশের দশ কোটি জনগণের প্রত্যেকের। ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকান, জনগণকে প্রতারিত করে কেহ কোনদিন রেহাই পায়নি। আপনাদেরকেও একদিন এর জবাবদিহি করতে হবে।

কারণ, জনগণের অধিকার একদিন না একদিন তারা নিজেরাই আদায় করে নেবে। যেমনটি করা হয়েছিল ১৯৫২ ও ১৯৭১-এ। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ আজ যারা ইংরেজী বর্জনের সংগ্রাম করছে, বঞ্চনার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে তারাই একদিন জাগবে, বুঝবে; আপনারা তাদের কি সর্বনাশটা করেছেন। আপনাদের শুধু সেই সময় আগমনের অপেক্ষা মাত্র। আমার মনে হয়, সেই দুঃসময় আসার আগেই আপনাদের সাবধান হওয়া উচিত।